BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY

RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link :: https://doi.org/10.70798/Bijmrd/020500018

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 5| June 2024| e-ISSN: 2584-1890

জীবনানন্দের কবিতায় ইন্দ্রিয় সচেতনতা ও অতীন্দ্রিয় অনুভব

মৌটুসী সাহা

Research Scholar, Department of Bengali

RKDF University, Ranchi

ভূমিকা:

দ্বন্দ্বময় বিচিত্র সংকট বিজড়িত অচরিতার্থ জীবনবাসনায় মর্মবিদ্ধ কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৮) কাব্যপরিসরও এক দুর্ভেদ্য রহস্য ঘেরা। তিনি চিত্রিত করেছেন আধুনিক মানুষের ক্ষতবিক্ষত জীবচেতনাকে, যা ক্রমবিচ্ছিন্নতার সূত্রে প্রত্যক্ষ-বিশ্ব হারিয়ে, পেয়েছে এক সংশয়ী নির্জনতা। যেখানে বস্ত্রমানবের আত্মা কেবল ধূসরতায়, ক্ষয়-ক্লেদ-পতনে ও বিবমিষায় আচ্ছন্ন। ইন্দ্রিয়বোধের গভীরতার নিমজ্জিত হয়ে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের সূক্ষ্মতম বোধকে উপলব্ধি করেছেন জীবনানন্দ বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জীবনের জটিলতায় নিমজ্জিত হয়ে ইন্দ্রিয় চেতনাকে স্থান দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। আবার যেখানে ইন্দ্রিয়জ যাত্রা একান্তই অসম্ভব সেখানে তিনি পৌঁছে গিয়েছেন অতীন্দ্রিয় চেতনার নিবিড়বাসনা ও অনুভব-সংরাগে।

মূলশব্দ: *জীবনানন্দ, ইন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয়।*

মূল বিষয়বস্তু :

মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল প্রবর্তিত ভারতীয় ধারা তিরিশের কবিদের মধ্যে সক্রিয় থাকলেও ইউরোপিয় সাহিত্য-শিল্পচর্চা ও বিজ্ঞানময় চৈতন্য থেকে নতুন এক রীতি-পদ্ধতি জন্মলাভ করে। আসলে প্রযুক্তিক্ষেত্রে দ্রুত বিকাশ এবং অতি যন্ত্রনির্ভরতা সমাজের মর্মমূলে যে দ্বন্দ্ববেদনা, জড়ত্ব, নৈঃসঙ্গ্য, দুঃখবেদনার সংকট সৃজন করে তা এই চৈতন্যে হয় আত্তীকৃত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর্যায় থেকেই ব্যক্তিসংকট সুতীব্র হচ্ছিল- যা মানুষকে শূন্যতায়, স্বপ্নভঙ্গের বেদনায়, অচরিতার্থ জীবনবেদনায় করেছিল অসহায়, নিরবলম্বন ও সন্ত্রস্ত। এই বিপর্যয় দু'টি বিশ্বযুদ্ধের সংঘটনায় যেমন তীব্র হয়েছে ঠিক তেমনই ব্যক্তিমানবের আস্তিত্বিক সংকট থেকেও পেয়েছে রঙস্বভাব। জীবনানন্দের অন্তর্লীন বিষাদজনিত স্বভাব, মৃত্যুর অনিবার্যতা থেকে সৃজিত নৈরাশ্য, ভাঙন, রক্তপাত এবং সময়স্রোতের অন্ধকার আবহপট তাকে করেছে আরও দুর্ভেদ্য, দুর্বোধ্য ও রহস্যময়। অনেক ক্ষেত্রেই, পাশ্চাত্য কাবারীতির মোড়কে এবং যুগমানসের পরিপ্রেক্ষিতে

ইতিহাসচেতনা, প্রকৃতিপ্রিয়তা, সমাজচেতনা, মগ্নচৈতন্য, ইন্দ্রিয়বোধ প্রভৃতি তাঁর কাব্যে চিত্রিত হয়েছে। ঝরাপালক (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থের অধিষ্ঠাতা আবেগ, তাই বিষাদ ও যন্ত্রণার চিত্রায়ন হৃদয়বেদনা থেকে উৎসরিত; অন্যদিকে ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬) হেমন্ত ও শীত ঋতুর প্রেক্ষাপটে চিত্ররূপময়। রোমান্টিক চেতনা যে আর যুগস্বরূপকে উদ্‌ঘটিত করে না এবং বিশ্বযুদ্ধোত্তর বন্ধুর পরিবেশ চিত্রায়নে অক্ষম তা অনুধাবন করেছিলেন। সুতরাং 'রোমান্টিসিজমের যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে, রিয়ালিজম ফিরে আসছে।[১] আবার রিয়ালিজমের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে আর এক তীক্ষ্ণ বোধের উপলব্ধি হচ্ছে, তা সুররিয়ালিজম বা অতিবাস্তব চেতনা'। অর্থাৎ জীবনানন্দের এই নবীন ভাব-উদ্দীপনা, আধুনিক চেতনায় এবং ইন্দ্রিয়সংবেশনে লাভ করেছে শীর্ষমাত্রার স্বচ্ছ অবস্থানভূমি। এই ইন্দ্রিয়সংবেশন দুর্ভেয়, সুবোধ্য কিংবা রহস্যময়তায় বিরাজিত- আধুনিক মানুষের সংশয়ী মানবাত্মার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পরিচয় প্রকাশক। যার ফলে তিনি হয়ে উঠেছেন আধুনিকতার এক নতুন তাৎপর্যে উচ্ছ্বল- মর্মমূলে রয়েছে আধুনিক মানুষের জটিল জীবনজিজ্ঞাসার সুগভীর আবর্তন। তিনি অন্ধকার উৎস থেকে উৎক্রান্ত এক বিপন্ন পথিক, নিঃসঙ্গ ক্লান্ত- হাজার বৎসর ব্যাপী পথপরিক্রমায় নিয়তিবদ্ধ এবং ঘটনার গহ্বরে পতিত হয়ে সুগভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু এসবের সমবায়ে সৃষ্ট অন্তর্বৃত রূপটি মুখশ্রী বীভৎস বা বিতৃষ্ণা-সঞ্চারক নয়, বরং বিষয়-সৌন্দর্যের অপরূপ বিমিশ্র চিত্ররূপই জীবনানন্দের মানস স্বকীয়তা।[২] এই অন্ধকার বহুমুখী শূন্যতাবোধে জারিত, তবে প্রথম কাব্যগ্রন্থ, হতেই তার সূচনা। প্রকৃতিচারনা আছে, তবে ঝরাপালক কাব্যগ্রন্থের প্রকৃতি ভিন্নতর তা অচরিতার্থ জীবনতৃষ্ণা পরিবাহী অন্যান্য কাব্যে সহজাতভাবে প্রকাশিত প্রকৃতি উপস্থিতির মতো নয়। আসলে পরবর্তী পর্যায়ে কলকাতা নগরের স্পর্শে, স্বপ্ন কল্পনার ভাঙনে, হতাশা ও শূন্যতাবোধ দ্বারা সৃজিত টানাপোড়েনে কবি আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি আপন মনোলোকে বিম্বিত এক বহুবিচিত্র পৃথিবী-প্রকৃতিকে ইন্দ্রিয়বোধ দিয়ে করেছেন চিত্ররূপময়।

ব্যাখ্যা:

মানুষের ইন্দ্রিয়বোধের তিমির-গভীরতার নিমজ্জিত হয়ে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের সূক্ষ্মতম বোধকে উপলব্ধি করতে হয়। জীবনানন্দ অবশ্য বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জীবনের জটাজালে নিমজ্জিত হয়ে এই একটি উপলব্ধিই নয়- ইতিহাসচেতনা, মৃত্যুচেতনা, চেতনা, সমাজচেতনা ও অতিবাস্তব চেতনাকে স্থান দিলেন কবিতার। কারণ মানুষের পুরোনো মূল্যবোধে ধরেছে ভাঙন, টেনশনের ঘূর্ণাবর্তে জীবন হয়েছে অস্থিরচিত্ত আর দিনযাপনের গ্লানিময় ধূসরতা পরিব্যাপ্ত হয়েছে সর্বত্র। তাই রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার রঙরূপময় ক্রীড়া বিস্বাদ ঠেকছে, শেলি কিংবা কিটস আর চিত্তবৃত্তিকে তাড়িতে করে না, কিংবা শব্দসঞ্জীবনে উদ্বেল করে না। আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি বোদলেয়ার-পাউন্ড-ইয়েটস-এলিয়ট প্রমুখের অমঙ্গলবোধ, অস্থির- চাঞ্চল্য, বিষাদ-বিচ্ছিন্নতা ও নাগরিক একাকীত্বে আস্থা অনুভব করতে থাকেন। তখন জীবনানন্দ দাশ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চমাধ্যম বেয়ে জীবনপ্রবাহলগ্ন হতে চাইলেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দার্শনিক নান্দনিক শিল্পচেতনাকে অবলম্বন করে— তাই তাঁর কবিতায় চিত্রধর্ম পেলো অধিক অবয়বত্ব। বুদ্ধদেব বসু কবি জীবনানন্দ দাশের অতীন্দ্রিয়বোধ সম্পর্কে বলেছিলেন, "তিনি মুখ্যত ইন্দ্রিয়বোধের কবি। ... ছবি আঁকতে তার নিপুনতা অসাধারণ। তার উপর ছবিগুলি শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শেরও বটে বিশেষভাবে গন্ধের ও স্পর্শের।[৩] তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত উপমাসমূহ এই ইন্দ্রিয়ঘনত্বকে যেমন প্রগাঢ় করে, তেমন সন্ধান দেয় ইন্দ্রিয়াতীত বছরও। কবিতায় উপস্থাপিত 'ঘুমের ঘ্রাণ', 'ঝিঁঝির ডাক', 'ধূসর গন্ধ', 'শিশিরের জল', 'ঘাসের ঘ্রাণ', 'হরিৎ মদ ইত্যাদি উপমা ইন্দ্রিয়কে মথিত করে জাগ্রত করে অতীন্দ্রিয়বোধকে। অর্থাৎ যেন সবকিছু শরীরীবোধ লাভ করে, 'বস্তু-অবস্তু, প্রাণী-

অপ্রাণী, মূর্ত-বিমূর্ত -সবকিছুই ইন্দ্রিয়বেদ্য শারীরিকতায় আলাদা আলাদা স্বরশ্রুতি-স্মৃতি-অস্তিত্ব নিয়ে তাঁর কবিতায় কথাসভায় শিল্পনিয়নদীপ হয়ে ওঠে।'[৪] এভাবে দৃশ্যমান বস্তুজগতের অন্তরালে লুকায়িত আরেক দুর্জয় রহস্যময় জগতকে কবি উপলব্ধি করেন- যার ফলে তাঁকে লকের দর্শন ও নিউটনের বিজ্ঞানের যান্ত্রিক ব্যাখ্যার বিপরীতে করতে হয় যাত্রা। আসলে ইন্দ্রিয় উপলব্ধিই যে একমাত্র চিরন্তন সত্য নয়, বোধি ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যে আরো এক জগতের সন্ধানলাভ করা যায় তা প্রমাণিত হয়। বিষয়টির যাথার্থ্য যাচাই করে জীবনানন্দের অতীন্দ্রিয়বোধ সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "...জগৎ ও জীবনের সীমাবদ্ধ দেশকালের মধ্যে আবর্তিত হয়েও তিনি অতি সূক্ষ্ম শব্দকল্পের অশরীরী পাখায় ভর করে যে রাজ্যে পৌঁছেছেন, তাঁর ইস্ত্রিময়তার স্বরূপ শুধু পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাতরদীপ জ্বালিয়ে অবধারণ করা যায় না।"[৫] সুতরাং অধরা অদেখা জগতের সন্ধানে কবিকে ব্যবহার করতে হয় ধ্বনি-ব্যঞ্জনার এক সংহত-সৌকর্য সৃজন। তাছাড়া ব্যক্তি জীবনানন্দ দাশও এই অতীন্দ্রিবোধের জগতের উর্ধ্বের কেউ নন, তাঁকেও মনোলোক ও প্রকৃতিলোকের মাঝে করতে হয় সেতুবন্ধ রচনা। জীবনানন্দ দাশের মানব প্রকৃতি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন-

"সেই তার নিজস্ব একান্তই তার দূর থেকে যাকে মনে হয় সুক্ষাতিসুক্ষ অলংকরণে অত্যন্ত বেশি আসর, স্বপ্নের আত্মচালনায় অত্যন্ত বেশি মসৃণ- কিন্তু যার ভিতরে একবার প্রবেশ করলে সহজেই নিঃশ্বাস নেয়া সহজেই বিশ্বাস করা যায়। এপার লাভের মতোই একর করে নেয়। সেখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না।"[৬]

প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরাপালক-এ কবিপ্রতিভার প্রাথমিক প্রভাদীপ্তি দৃশ্যমান হয়, তবে নিজস্ব ঘর ও সুরের সন্ধানে তখনও তিনি সদাচঞ্চল। ক্রমে আবেগ নিছক তাড়নায় সীমাবদ্ধ রইল না, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির প্রভৃতি কাব্যে এসে অতীন্দ্রিয় সত্তার ধ্যানে অধিক নিমজ্জিত হলো। কবি পরিভ্রমন করলেন প্রকৃতি-চেতনা থেকে ধারণকৃত শব্দ নৈঃশব্দের মিথস্ক্রিয়ায়, বিষণ্নবেদনায় কাতর অচরিতার্থ প্রেমে সমাজ জীবনের রূঢ়তা কুশ্রীতা অবসাদ গ্লানি ও জটিল যুগযন্ত্রণায়। আসলে বস্তবিশ্বকে বিরামহীনভাবে জীবনজগতে রূপান্তরিত করে এগিয়ে চলছে মানুষের জয়যাত্রা। আমরা জানি, অনুপ্রাণের আলোড়নে প্রীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা মানবদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিনিয়ত প্রবহমান। সেই প্রবাহিত জীবনধারার জলভাণ্ডার আধুনিক মানুষের হাতে পড়ে অবশিষ্ট নেই- শুস্ক, শীর্ণ হয়ে গেছে তার স্রোতধারা। যার ফলে জীবনানন্দীয় অনুভূতি- ভাষার আলোড়নে 'দু'দণ্ড শান্তির অন্বেষনে থাকে আধুনিক মানুষ, কিংবা অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চায় --যা ইন্দ্রিয়াতীত, অপ্রাকৃত ও অদৃশ্যলোকের চিহ্নপট। এর পেছনে রয়েছে লোকভীরু কবির আপনভোলা কবিত্বের নির্জনবাস, একাকীত্বের দুর্গম পথযাত্রায় একনিষ্ঠ পথিক হবার বাসনা। 'সমস্ত সত্তা দিয়ে, সমগ্র চেতনা দিয়ে তিনি বিশ্ববোধ ও ব্যক্তিবোধের সমন্বয় খুঁজেছেন, কখনো আত্মার গভীরে হারিয়ে গেছেন, কখনো দূর দেশ-কালের স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্যে পথ চলেছেন। জীবনানন্দকে তাই চিরপথিক বলে মনে হয়, পথ চলতেই তাঁর আনন্দ।'[৭] এভাবে চলতে-চলতে এবং উপমাই কবিত্ব- এই বিশ্বাসকে ধারণ করে পরিচিত জীবন ও পৃথিবীর রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন কবি। এ-সময়ের কবিতায় বিরোধাভাস অলংকারের মধ্য দিয়ে কবিতায় অতীন্দ্রিয়বোধ প্রকাশিত হয়েছে, জীবনানন্দও এর ব্যতিক্রম থাকেননি। আর অতীন্দ্রিয় বিরোধাভাস পাঠককে যুক্তিধর্মী, প্রাকৃতিক, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে সমস্ত যুক্তির উর্ধ্বে এক অলৌকিক জগতে স্থানান্তরিত করে। দৃশ্যমান পৃথিবী পরিত্যাগ করে অদৃশ্য অতিচেতন হেঁয়ালির জগতে পৌঁছে যায়।

রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতা পড়ে বলেছেন-চিত্ররূপময়', আর প্রতীক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক প্রভৃতির আলংকারিক প্রয়োগ-নৈপুণ্যেও এর প্রমাণ উপস্থিত। বিশেষভাবে এই 'বিরোধাভাস" অলংকারাটি জীবনানন্দ প্রয়োগ

করেছেন চিত্রময় কবিতার শরীর ও আত্মা নির্মাণে। ইংরেজিতে যা 'Oxymoron', বাংলায় তা 'বিরোধাভাস'- অর্থাৎ আপাতবিরোধের আড়াল থেকে কোনো বিশেষ অর্থ উন্মোচনের প্রচেষ্টা। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, 'Oxymoron' তা-ই প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়। 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতায় পাই কবির আত্মবিরোধী মনোভাবের উদাহরণ-

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,

যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা

যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই- প্রীতি নেই- করুণার আলোড়ন নেই

পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি

এখনো যাদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়

মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা

শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।" (অদ্ভুত আঁধার এক)

'অদ্ভুত আঁধার এক' এসেছে কথাটি উচ্চারণ করে জীবনানন্দ অন্যায় প্রতিকারহীন এক দুর্বিপাকের কথা বলেছেন, যেখানে 'অন্ধকার' শব্দটি এই কষ্ট-পীড়নকে চিত্রায়িত করে। কেননা কবি যখন বলেন "যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা" তখন কষ্ট-পীড়ন, অশ্রু ক্ষরণে জরিত এক বাস্তবতা অনুভূত হয়, যে জীবনবাস্তবতায় পৃথিবীতে আজ তারাই শক্তিশালি ও সুবিধাভোগী 'যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই - প্রীতি নেই - করুণার আলোড়ন নেই।' আর যারা মহৎ, সৎ এবং যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি- 'শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়'। এভাবে ইন্দ্রয়াতীত, অভূতপূর্ব শব্দ ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক মানুষের অস্থির চ্যপূর্ণ জীবন ও বিদ্যমান অবস্থার নষ্ট রূপ প্রকাশ করেছেন। আবার লৌকিক জগত পরিত্যাগ করে 'হাওয়ার রাত' কবিতায় আর এক অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করেছেন কবি-

"সময় মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিলো-আকাশে একতিল ফাঁকা ছিলো না;

পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখেও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি;

অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশিরভেজা চোখের মত

ঝলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা;" (হাওয়ার রাত)

"হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে

হিজলের ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে-" (হরিণেরা)

"সুচেতনা, তুমি এক দূরতম দ্বীপ

বিকেলের নক্ষত্রের কাছে।

সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে

নির্জনতা আছে।”   (সুচেতনা)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আমরা প্রথমে সমস্ত মৃত নক্ষত্রদের জেগে উঠতে দেখি- যেন এই বস্তুসমূহের প্রাণ আছে। আর তখন ‘আকাশে একতিল ফাঁকা ছিল না’ এবং সমস্ত নক্ষত্র ‘প্রেমিক চিলপুরুষের শিশিরভেজা চোখের মত ঝলমল করছিল’। সুতরাং যে জগৎ এখানে কবি সৃষ্টি করেছেন তা ইন্দ্রয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান বস্তুজগত নয়, বস্তুজগতের অন্তরালে থাকা এক অসীম দুর্ভেদ্য জগৎ। অথচ পরিচিত পৃথিবী থেকেই উপমা-উৎপ্রেক্ষা-প্রতীক, রূপকল্প সৃজন করেছেন কবি- কিন্তু কবির কৃতিত্ব এখানেই যে প্রত্যক্ষ জগতের অতীত এক ইন্দ্রিয়াতীত ভাবজগৎকে অনুভব করা সম্ভব হচ্ছে। তাই তো অচরিতার্থ প্রেমের বাসনা নিয়ে ‘হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস’ হাসে, কিংবা ‘সুচেতনা এক দূরতম দ্বীপ’- যাদের নৈকট্য চেয়ে স্বপ্নে ভাঙাগড়ায় বাধিত হতে হয়। অর্থাৎ চিন্তার জগত একটি নিরন্ধ্র অন্ধকারপটে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, যেখানে সর্বত্র ঘোষিত হচ্ছে বিচ্ছিন্নতার আর্তস্বর। আসলে আধুনিক যুগের আগমনে পুরাতন মূল্যবোধ যেহেতু ক্রম:অপসৃয়মান, তাই কেবল রোমান্টিক ভাবনা দিয়ে যুগস্বরূপকে যে উদ্ঘাটন সম্ভব নয়- তা কবি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ‘রোমান্টিসিজমের যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে, রিয়ালিজম্ ফিরে আসছে। আবার রিয়ালিজমের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে আর এক তীক্ষ্ণ বোধের উপলব্ধি হচ্ছে, তা হলো সুররিয়ালিজম বা অতিবাস্তব চেতনা।’[৮] সুতরাং এই ‘বিচ্ছিন্নতার আর্তস্বর’ তিরিশের কাব্যধারায় নতুন সুরের মূর্ছনা তুলে ধরে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। অবশ্য জীবনানন্দ দাশ এই বিচ্ছিন্নতা, যুগযন্ত্রণা, জীবনযাত্রার জটিলতাকে কাব্যে ধারণ করেছিলেন বলে বৃহত্তর পাঠকেরা সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তবে পাঠকদের এই অনীহা তিরিশের কবিরা বরাবর এড়িয়ে গেছেন এই যুক্তিতে যে, কাব্যে প্রকাশিত দুরূহতা আধুনিক যুগমানসের প্রতিবিম্ব। তাদের মুক্তি, কাব্য-উপলব্ধির জগতেও আধুনিক মানুষকে অলস ও পশ্চাদপদ হলে চলবে না। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

“দুরূহতার দুটো দিক আছে, একটা পাঠকের দিক, অন্যটা লেখকের। যে দুরূহতায় পাঠকের আলস্য তার জন্য কবির উপরে দোষারোপ অন্যায়। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত বাদ দিলেও, কলার অন্যান্য বিভাগে প্রবেশাধিকার যে আগ্রহ, অভিনিবেশ ও অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে, কবি যদি তার বিভাগ থেকে সেই পরিমান শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা চায়, তাহলে তার দাবি নিশ্চই সঙ্গত।”[৯]

এভাবে জীবনানন্দ কবিতায় যে সমস্ত নারীমূর্তি গড়েছেন তারা আধুনিক, তবে তাঁর কল্পনামনীষার স্পর্শে তারা অলৌকিক, দুরূহ ও দুর্বোধ্য। নামের সঙ্গে পদবী থাকলেও অনেক নায়িকাই কবি কল্পিত। অর্থাৎ কবি-সৃজিত ‘বনলতা সেন’, ‘সুরঞ্জনা’, ‘শেফালিকা বোস’, ‘অরুণিমা সান্যাল’, ‘মৃণালিনী ঘোষ প্রভৃতি কখনো লৌকিক কখনো অলৌকিক, আবার কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থেকে অতীন্দ্রিয়লোকের বাসিন্দায় পরিণত হয়েছে। ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থের ‘আকাশলীনা’ কবিতায় ‘সুরঞ্জনা’ একই সাথে কালোত্তীর্ণ এবং ইন্দ্রিয়-উত্তীর্ণ--

“সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়ো নাকো তুমি,

বোলো নাকো কথা অই যুবকের সাথে;

ফিরে এসো সুরঞ্জনা :

নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে;" (আকাশলীনা)

আবার জীবনানন্দের নাটোরের বনলতা সেন কী বাস্তব জগতের কোনো নারী? আধুনিক গবেষকবৃন্দ এই প্রশ্নেও দ্বিধাবিভক্ত। তাঁরা কোনো কোনো বিশেষ বাস্তব নারী চরিত্রের সাথে তুলনা করলে কিংবা সাদৃশ্যসূত্র আবিষ্কারে সচেষ্ট হলেও 'বনলতা সেন' নামক নারী চরিত্রটি রহস্যময়ী রয়ে গেছে। এ ছাড়াও অনেক অনাম্নী অঙ্গনা আছে জীবনানন্দের কবিতায়। তাদের অনেকেই কল্পনাসম্ভব, বিস্ময়-রহস্যময়ী, অ-লোক-মানবী। কখনও সে আবৃত মুখ; কবির সামনে কেবল তার 'নগ্ন নির্জন হাত'। দূর অতীতের কোনও খিলান গম্বুজের প্রসাদে, রামধনু কাচের জানালা, ময়ূর পেখম পর্দা আর 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ'-এর পাশে নগ্ন নির্জন হাত। এভাবে নারীমূর্তি- প্রেমিকা-প্রেয়সী বিষয়ে কবি নিজেই দুর্গম দুয়ে রহস্যময়তা গড়ে তুলেছেন। যেখানে ইন্দ্রিয়জ যাত্রা অসম্ভব সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন অতীন্দ্রিয় চেতনার নিবিড়বাসনা ও অনুভব-সংরাগে।

উপসংহার:

জীবনানন্দের কাব্যপাঠে উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁর কবিচিত্ত সর্বদা পুনরুত্থানের আকাঙ্ক্ষায় বিমর্ষ ও ব্যথিত। তাই তো ব্যক্তিগত জীবনের আত্মমগ্নতা, বিষণ্ণতা, হতাশাবোধ, ক্লান্তি, বিচ্ছিন্নতা, মৃত্যুচেতনা ইত্যাদি অনুষঙ্গকে কাব্যশিল্পে গেঁথেছেন সচেতনভাবে। তবে জীবন-জগত ও বস্তুবিশ্বের সীমাবদ্ধতায় আবর্তিত হয়েও কাব্যচেতনার অলৌকিক পাখায় ভর করে যে জগতে তিনি পৌঁচেছেন তা কেবল পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্পর্শে অনুধাবন করা যায় না- এর জন্য অতীন্দ্রিয় চেতনার অনুভবলোকের দরজাও উন্মোচনের প্রয়োজন হয়। তাই তো জীবনানন্দ দাশ তাঁর কাব্য-নির্মাণে পার্থিব ইন্দ্রিয়জ জগত থেকে অপার্থিব অতীন্দ্রিয় জগতে কাব্যরহস্যের জাল বিস্তার করেছেন। সুতরাং তাঁর কাব্যলোকে অতীন্দ্রিয় চেতনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে যা কাব্যনির্মাণের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র রীতির উদাহরণ হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১) দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, পৃষ্ঠা-১৬৩

২) বেগম আকতার কামাল, জীবনানন্দ চেতনা ও ঋতুর প্রতিসাম্য, পৃষ্ঠা-৭৬

৩) বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, পৃষ্ঠা-৫২

৪) বেগম আকতার কামাল, জীবনানন্দ কথার গর্বে কবিতা, পৃষ্ঠা-১৫

৫) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যেও সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃষ্ঠা-৭৩২-৭৩৩

৬) বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, পৃষ্ঠা- ৩৩

৭) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃষ্ঠা-৭৩২

Published By: www.bijmrd.com ll All rights reserved. © 2024

৮) দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, পৃষ্ঠা-১৯২

৯) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কাব্যের মুক্তি, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, পৃষ্ঠা-৩৩

গ্রন্থপঞ্জি:

১. দাশ প্রভাতকুমার, জীবনানন্দ দাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯

২. ভট্টাচার্য তপোধীর, জীবনানন্দ কবিতার সংকেত বিশ্ব, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০১

৩. বন্দ্যোপাধ্যায় হিমবন্ত, আমার জীবনানন্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৩

৪. বসু অমলেন্দু, জীবনানন্দ, বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৬

৫. মজুমদার সেন জহর, জীবনানন্দ জটিলতা উত্তর আধুনিকতা, ভারতী সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯৩

৬. ভট্টাচার্য তপোধীর, জীবনানন্দ কবিতার নন্দন, একুশ শতক, কলকাতা, ২০১০

৭. মুখোপাধ্যায় তরুণকুমার, জীবনানন্দ জিজ্ঞাসা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০

৮. ভট্টাচার্য বীতশোক, জীবনানন্দ, বাণী শিক্ষা, কলকাতা, ২০০১

৯. মজুমদার সেন জহর, জীবনানন্দ ও অন্ধকারের চিত্রনাট্য, মডেল পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩

১০. মিত্র, মঞ্জুভাষ, কবিতার কারুকার্য ও জীবনানন্দ দাশ, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৮

১১. ত্রিপাঠী দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২

১২. দত্ত আশা, বঙ্গসাহিত্যে সাহিত্যচিন্তার ধারা, গ্রন্থালয় প্রা: লি:, কলকাতা, ১৯৯৭

১৩. নায়ক জীবেশ, বাংলা কবিতায় আধুনিক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৯

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থপ্রতিম, পোস্ট মডার্ন ভাবনা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৭

১৫. বসু বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬

১৬. দাশ জীবনানন্দ, জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ, সম্পা.- দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৩

Citation: **সাহা. মৌ.,** (2024) "জীবনানন্দের কবিতায় ইন্দ্রিয় সচেতনতা ও অতীন্দ্রিয় অনুভব" *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-5, June-2024.